অর্থ মন্ত্রণালয়

# বাৎসরিক বাজেট

২০০০–০১

# বাজেট বক্তৃতা

শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া

অর্থমন্ত্রী

## (প্রথম পর্ব)

ঢাকা

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ বাংলা

৮ই জুন, ২০০০ ইংরেজী

*বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম*

মাননীয় স্পীকার,

আমি ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেট ও ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

২। মহান জাতীয় সংসদে পর পর পাঁচটি জাতীয় বাজেট পেশ করার দুর্লভ সুযোগ লাভের জন্য আমি প্রথমেই পরম করুনাময় আল্লাহ-তায়ালার কাছে শোকর আদায় করছি। এই গুরু দায়িত্ব পালনে প্রাজ্ঞ দিক-নির্দেশনা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা ।

৩। নতুন শতাব্দী এবং নতুন সহস্রাব্দের উষালগ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের পঞ্চম জাতীয় বাজেট মহান সংসদে উপস্থাপন করার গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে এই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন। একদিন তাঁরই বজ্রকন্ঠের উদাত্ত আহ্বানে বীর বাঙালী অস্ত্র ধরেছিল এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করেছিল। স্মরণ করছি সেই অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের - যাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গৌরবগাঁথা যুগ যুগ ধরে আগামী দিনের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি শ্রদ্ধা

নিবেদন করছি জাতির জনকের সুযোগ্য অনুসারী চার জাতীয় নেতাকে। কারাগারের অভ্যন্তরে তাঁদের নৃশংস হত্যাকান্ড আমাদের ইতিহাসের একটি কলংকজনক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র আবার তাদের অশুভ তৎপরতা শুরু করেছে। রাজাকার ও স্বৈরাচারের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ অনুধাবন করে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক উদ্বিগ্ন। সমগ্র জাতি আজ গভীর বেদনা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, জাতির জনক এবং তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের বিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী প্রতিটি বিবেকবান বাঙ্গালীর মনে আজ প্রশ্নঃ পঁচিশ বছর পরও জাতির জনকের হত্যাকান্ডের বিচার চূড়ান্ত করার সময় কি এখনও আসেনি? এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই বিচার প্রক্রিয়া অবিলম্বে সমাপ্ত করে বিচারের রায় কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন।

৪। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোষনা করেছিলঃ "স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শোষনমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্খা ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ"। আজ আমি প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

৫। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের এক ক্রান্তি লগ্নে মুক্ত ও নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহন করে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে"। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি একদিকে দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং অন্যদিকে সারা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

৬। একইভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদা করা হয়েছিল, "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যম চুক্তি সম্পাদন করে সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করবে"। ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি এই প্রতিশ্রুতিরই সার্থক বাস্তবায়ন। এই চুক্তি বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করেছে এবং দেশের পশ্চিম-দক্ষিন অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষনের ভিত্তি রচনা করেছে। দুই দশকের বন্ধ্যা নীতি পরিহার করে বর্তমান সরকার দক্ষিন এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে ইউনেস্কো শুধু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দেয়নি বরং বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্ব সমাজে বিশেষ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় দু'টি রাষ্ট্রের পারমানবিক বিস্ফোরনের ফলে উদ্ভূত অশান্ত পরিস্থিতিতে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনার

লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কোর শান্তি পুরস্কার প্রদান, ১৭২টি রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সহ বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র প্রধানের বাংলাদেশ সফর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। একথা আজ অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ একটি গর্বিত নাম। বিশ্বক্রীড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আমলেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের ক্রিকেট ও ফুটবলের খেলোয়াড়রা বাংলাদেশের জন্য নিয়ে এসেছে সাফল্যের গৌরবমাল্য। আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ জাতির দৃষ্টি আজ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ।

৭। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরশীল সূচক হল জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি। বর্তমানে বাংলাদেশে এ প্রবৃদ্ধির হার দু'ধরনের সূচকের ভিত্তিতে প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। এতদিন পুরোনো সূচক অনুসারে ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরকে দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিবর্ষ গণ্য করে জাতীয় উৎপাদ পরিমাপ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা নতুন সূচকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরকে দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গণ্য করে প্রবৃদ্ধির হার গণনা করছি। ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর সময়কালে পুরোনো সূচক অনুসারে স্থুল জাতীয় আয়ের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৪ শতাংশ, একই সময়ে নতুন সূচক অনুসারে গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫ শতাংশ। ১৯৯৬-৯৭ হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্য্যন্ত সময়কালে পুরোনো সূচক অনুসারে প্রাক্কলিত

বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার হলো ৫.৫ শতাংশ আর নতুন সূচকের ভিত্তিতে এ হার হবে ৫.১ শতাংশ।

৮। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ অভিক্ষেপ অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে পুরোনো সূচক অনুসারে প্রবৃদ্ধির হার হবে ৬ শতাংশ আর নতুন সূচক অনুসারে ৫.৫ শতাংশ। যে কোন সূচকের ভিত্তিতেই এই হার হিসাব করা হোক না কেন, এ সত্য কোন প্রকারেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশে যে হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এত উঁচু হারে বাংলাদেশে এর আগে কখনও জাতীয় উৎপাদের প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়নি।

৯। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রবৃদ্ধি নিস্তরঙ্গ অর্থনৈতিক পরিবেশে অর্জিত হয়নি। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অর্থনৈতিক ধস এক অশান্ত ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শতাব্দীর দীর্ঘতম ও প্রলয়ংকারী বন্যা দেশের অর্থনীতিতে প্রচন্ড আঘাত হানে। ২০০০ সালের মার্চ মাসে জ্বালানী তেলের মূল্য গত নয় বছরের মূল্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পণ্য মূল্য বৃদ্ধি শুধু জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে সীমিত থাকেনি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব অনুসারে গত এক বছরে জ্বালানী তেল ছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যের মূল্য প্রায় পাঁচ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশে শুধু জ্বালানী তেল আমদানী বাবদ ব্যয় প্রায় ২৩৭ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধমুখী প্রবণতা এখনও বাংলাদেশে সংক্রমিত হয়নি। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বন্যার ফলে মূল্যস্ফীতির হার (বার

মাসের গড়ের ভিত্তিতে) ৮.৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার ফলে এ বছরের এপ্রিল মাসে (বার মাসের গড়ের ভিত্তিতে) মূল্যস্ফীতির হার ৪.৫৮ শতাংশে নেমেছে। অবশ্য গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় বর্তমান বছরের এপ্রিল মাসে (point to point) মূল্যস্ফীতি বেড়েছে মাত্র ৩.০৯ শতাংশ।

১০। ১৯৯৮ সালের মহাপ্লাবনের পর অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার দুরূহ কার্যক্রম বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট থেকে বার বার বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। দিনের-পর-দিন হরতাল, অবরোধ এবং ভাংচুরের মাধ্যমে অর্থনীতিকে স্থবির ও বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। ইস্যুবিহীন এবং জনসমর্থনবিহীন এসব কর্মকান্ডের ফলে দেশের লাখ লাখ শ্রমিক, হকার, দোকানদার, রিক্সাওয়ালা এবং খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরম পরিতাপের বিষয় যে, দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে বিগত এপ্রিল মাসের প্যারিস বৈঠকে দাতাদেশগুলোকে বাংলাদেশকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য তদবির (lobbying) করা হয়েছে। জনস্বার্থ বিরোধী এসব নেতিবাচক তৎপরতা সত্ত্বেও আমরা উচ্চহারে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জণ করতে পেরেছি এবং মূল্যস্ফীতিও হ্রাস করতে পেরেছি। সুষ্ঠু ও সতর্ক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ফলে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রতিকূল আঞ্চলিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ সত্ত্বেও জনগণের নিরলস শ্রম এবং তাঁদের দুর্জয় আত্ম-প্রত্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে।

১১। বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে একটি বিপর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। আমি মহান সংসদকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের নিম্নলিখিত মূল্যায়ণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ "পাঁচ বছরে বিএনপি সরকার দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুধুমাত্র ন্যায্য মূল্যে সারের দাবিতে পতিত সরকারের শাসনামলে ১৮জন কৃষককে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। খাদ্যে বিদেশ-নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী লীগ এ ব্যবস্থার অবসান করবে"। আমি আজ গর্বের সাথে দাবি করছি যে, কৃষি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার নির্বাচনী ওয়াদা শেখ হাসিনার সরকার সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছে। বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহন করে তখন দেশে খাদ্যশস্যের বাৎসরিক মোট উৎপাদন ছিল ১.৯ কোটি টন। চলতি অর্থ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় ২.৪৩ কোটি টনে দাঁড়াবে। চার বছরের মধ্যে বাৎসরিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫৩ লক্ষ টন বাড়ানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে খাদ্য উৎপাদন ১.৯৩ কোটি টন হতে ১.৯ কোটি টনে হ্রাস পেয়েছিল। পর পর চার বছর ধরে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমান খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। কৃষি খাতে এই অভূতপূর্ব উৎপাদন বর্তমান সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাফল্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১২। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল "প্রয়োজনে এ খাতে যথোপযুক্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে"। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে গত চার বছরে সার আমদানীর জন্য ৪১১ কোটি টাকা নগদ ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। অথচ বিগত সরকারের আমলে

সারের জন্য এ ধরনের কোন ভর্তুকি দেয়া হয়নি। ঐ সময়কালে সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও কোন ভর্তুকি দেওয়া হয়নি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় ছিল ২.৬৩ টাকা, অথচ সেচ যন্ত্রের জন্য বিদ্যুতের শুল্ক নির্ধারিত হয়েছে ১.৭৫ টাকা। চলতি অর্থ বছরে তাই সেচ যন্ত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উৎপাদন মূল্যের প্রায় ৩৩ শতাংশ হারে প্রচ্ছন্ন ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সেচ যন্ত্রে ব্যবহৃত জ্বালানি ডিজেলের উপর প্রচ্ছন্ন ভর্তুকির হার ছিল ৯.৩ শতাংশ; ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই প্রচ্ছন্ন ভর্তুকির হার ২৬.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

১৩। সেচ যন্ত্র, পাওয়ার টিলার এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে দেশে একটি কৃষি-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। মেহনতি কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের সরকারী ক্রয়মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে আমন চালের কুইন্টাল প্রতি ক্রয়মূল্য ছিল ১১০০ টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই ক্রয়মূল্য ১২৫০ টাকাতে উন্নীত করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে একই সময়ে প্রতি কুইন্টাল বোরো চালের সংগ্রহ মূল্য ১১২৫ হতে ১৩০০ টাকাতে বাড়ানো হয়েছে আর গমের সংগ্রহ মূল্য ৭৫০ টাকা হতে ৮৮০ টাকাতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শুধু ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩০০৫ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশে এর আগে কখনও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এত বেশি কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়নি।

১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে গড়ে বছরে ১১৪১ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ হতে ১৯৯৮-৯৯ সময়কালে গড়ে বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ হলো ২০৫৫ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থ বছরে প্রথম নয় মাসে ইতোমধ্যে ২০০৯ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষির আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিগত সরকারগুলোর আমলে লক্ষ্যহীন এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফলে কৃষি ঋণ প্রদানের পরিমাণ এবং ঋণ আদায় ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। উপরন্তু দুর্নীতির কারণে কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং প্রচলিত নীতিমালা সংশোধনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত, দুর্নীতিমুক্ত এবং সহজলভ্য করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলেই অতীতের নিয়ম পরিবর্তন করে গ্রাম বাংলার বর্গাচাষীদেরও, যাঁরা কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরাসরি জমিতে কাজ করে, বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের নীতি প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু কৃষি ব্যাংক থেকেই প্রায় এক লক্ষ বর্গাচাষীকে সহজ শর্তে কৃষিঋণ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এই সময়ে প্রায় ৭.৫০ লক্ষ নতুন ঋণগ্রহীতা কৃষিঋণ লাভে সক্ষম হয়েছে। দুর্গম পল্লী অঞ্চলে যেসব স্থানে কৃষি ব্যাংকের শাখা ছিল না সেসব অঞ্চলে ৯৬৪টি বুথ খুলে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, শুধু ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রেই নয়, বর্গাচাষী সহ প্রতিটি শ্রেনীর ক্ষেত্রেই ঋণ আদায় পরিস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত নীতি অনুসারে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক নতুন শাখা স্থাপন করে তাদের কর্মকান্ডের পরিধি সম্প্রসারিত করেছে। উপরন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানীর মাধ্যমে

বর্তমান সরকার কৃষকদের আয় বৃদ্ধির বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের কৃষি সহায়ক এবং গনমুখী নীতিমালা প্রমান করেছে যে, মেহনতি কৃষকদের জন্য অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব।

মাননীয় স্পীকার,

১৫। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ায় এবং বিশেষ করে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র পরিস্থিতিতে ক্রমেই উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে দেশের জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। ১৯৯৯ সালের মে মাসে এই হার ৪৪.৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। সাথে সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নেও লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বয়স্কদের শিক্ষার হার ছিল ৪৪ শতাংশ, এই হার ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির স্থূল হার ৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাফল্যজনক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৫৮.৯ বছর। ১৯৯৮ সালে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৬০.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯১ হতে ১৯৯৬ সময়কালে গড়ে বছরে প্রত্যাশিত গড় আয়ু বেড়েছে ৬.৭ মাস, অথচ ১৯৯৬ হতে ১৯৯৮ সময়কালে এই হার গড়ে ১০.৮ মাস বেড়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯৬ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৬৭; ১৯৯৮ সালে এই হার হলো ৫৭। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণের পরিমান ছিল ২২১৬

কিলো ক্যালরী, ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে এই পরিমান হয়েছে ২২৮৩ কিলো ক্যালরী। মাথা পিছু আয়ের প্রাক্কলন ও সামাজিক উন্নয়নের সূচকসমূহ সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে গত চার বছরে দারিদ্র নিরসনে বাংলাদেশ একটি নতুন যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে।

১৬। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র বিমোচনের জন্য আবশ্যিক হলেও যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যারা অর্থনীতির মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছায় না। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৩ - এ যথার্থই বলা হয়েছেঃ "But there will always be those excluded wholly or partially by the market: the very young, the very old, the disabled and those with heavy domestic commitments" (সব সময়েই এমন ধরনের জনগোষ্ঠী থাকবে যারা বাজার কর্তৃক সম্পূর্ণ বা অংশতঃ উপেক্ষিত হবেঃ অতি অল্প বয়স্ক, অতি বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং যারা গার্হস্থ্য দায়িত্বের গুরুভারে জর্জরিত)। বাজার ভিত্তিক উন্নয়ন আমাদের মূল লক্ষ্য নয়; জনগণের কল্যাণই হলো আমাদের অভীষ্ট। তাই গত চার বছর ধরে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার উদ্ভাবনমূলক ও কার্যকর প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিতভাবে সামাজিক নিরাপত্তার জাল সৃষ্টি করেছে।

১৭। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বছরে ৪ লাখের বেশি বয়োবৃদ্ধদের মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে দুস্থ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচী চালু করা হয়। এই কর্মসূচীর

অধীনে প্রায় দু'লাখ মহিলা সরকারী ভাতা পাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক অনুদান নিয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হয়েছে। অসহায় বয়োবৃদ্ধদের আশ্রয় ও শুশ্রুষার জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়টি শান্তি নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। ৫০ হাজার গৃহহীনদের আশ্রয় দানের প্রাথমিক লক্ষ্য সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীতে ১৭,২৬০টি হতদরিদ্র গৃহহীন পরিবারের জন্য ৬০.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ৫৮ কোটি টাকা অনুদান নিয়ে গৃহায়ণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে এ তহবিলে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। এ তহবিল থেকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৬২টি জেলার ২০২টি উপ-জেলায় প্রায় বাইশ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য ৪৩.৫০ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার লোক উপকৃত হবে। ১৯৯৮ সালে যুব সমাজের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে ৭৫ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে কর্ম সংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতোমধ্যে ২৪টি জেলা সদরে এই ব্যাংকের শাখা চালু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। একদিন এ দেশের মানুষ জাতির জনকের আহবানে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল; আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশবাসী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ডাকে একইভাবে সাড়া দিয়ে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জয়যুক্ত করবে। পাঁচ কোটি টাকার প্রাথমিক অনুদান নিয়ে নির্যাতিতা, দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত চার বছর ধরে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য কর্মসূচীর দ্রুত সম্প্রসারন করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৪২ লক্ষ দুস্থ পরিবারকে ৭ মাস ধরে প্রায় ৫৮৫ কোটি টাকার খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ২৩.৫৭ লাখ পরিবারকে তিন মাসের জন্য ও ৪২.১৬ লক্ষ পরিবারকে দুই মাসের জন্য খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ভি,জি,এফ খাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ২২৯ কোটি টাকা। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য উপরে উল্লেখিত কর্মসূচীসমূহের জন্য ইতোমধ্যে ১২২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। উপরন্তু সরকারের চৌদ্দটি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীতে ২০৩৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বেসরকারী সংস্থাসমূহ ৮৭ লক্ষ ঋণগ্রহীতার কাছে প্রায় ৭৭৩৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। আমরা জানি যে বাংলাদেশের ব্যাপক ও জটিল দারিদ্র নিরসনের জন্য চার বছর সময় নেহাত অপ্রতুল। তবু বর্তমান সরকারের উদ্ভাবনমূলক ও সৃজনশীল প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশে দারিদ্র নিরসনের টেকসই ভিত্তি রচনা করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

১৮। সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত না করতে পারলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় শূণ্যগর্ভ, আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া সামাজিক ন্যায় বিচার কখনও শিকড় গাড়তে পারে না। বর্তমান সরকার তাই সামাজিক নিরাপত্তার জাল সম্প্রসারনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বর্তমান সরকার টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও ভৌত অবকাঠামো খাতকে বেসরকারী বিনিয়োগ বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উম্মুক্ত করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিগত সরকারের আমলে দলীয় স্বার্থে অনুসৃত নীতির ফলে সেলুলার টেলিফোনের

মূল্য এক লাখ টাকার বেশী ছিল, কিন্তু বর্তমান সরকারের উদার ও জনকল্যাণমূলক নীতির ফলে আজ জনগণ ঐ একই টেলিফোন দশ হাজার টাকারও কম মূল্যে ক্রয় করতে পারছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ভৌত অবকাঠামো খাতে বিদেশী বিনিয়োগ ছিল ২৮৬ মিলিয়ন ডলার, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এই বিনিয়োগ ৭৪৮ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আর্থিক খাতে সংস্কার ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অতীতের পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণের বিপুল বোঝায় ভারাক্রান্ত ব্যাংকিং খাতে বর্তমান সরকার শৃঙ্খলা অনেকাংশে ফিরিয়ে এনেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি নিবিড় ও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে ব্যাংকিং খাতকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দেউলিয়া আইন জারী করা হয়েছে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে স্বতন্ত্র অর্থ ঋণ আদালত ও দেউলিয়া আদালত চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে পর্য্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ও ব্যাংক কোম্পানী আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পুঁজি বাজার কর্মসূচী বাস্তবায়ন অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় চারটি আইনের সংশোধনী ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন শীঘ্রই তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে। উপরন্তু ১৯৯৬ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের (democratization of democracy) লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আইন ইতোমধ্যে সংশোধন করা

হয়েছে এবং নবনির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদসমূহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়েছে। জেলা পরিষদ আইন সংক্রান্ত বিল ইতোমধ্যে মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। পৌরসভা ও নগর কর্পোরেশনসমূহের আইন ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং পৌরসভা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

১৯। জনৈক মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক যথার্থই বলেছেন: "An idealist believes the short run does not count. A cynic believes the long run does not matter. A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run" (আদর্শবাদীরা বিশ্বাস করে যে স্বল্প মেয়াদের কোন তাৎপর্য নেই। হতাশাবাদীরা মনে করে যে দীর্ঘ মেয়াদেও কিছু যায় আসে না। যারা বাস্তববাদী তারা জানে যে, স্বল্প মেয়াদে যা করা হয় এবং যা করা হয় না - উভয়েই দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ন্ত্রণ করে)। সংস্কারের ক্ষেত্রেও যা করা হয়েছে এবং যা করা হয়নি উভয়েই অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সংস্কার করা হয়েছে সেখানে সুফল পাওয়া গেছে। যেমন প্রয়োজনীয় সংস্কারের ফলে টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। আর্থিক খাতে সংস্কার কর্মসূচীর ফলে দেশে আজ খেলাপি ঋণের বিপক্ষে অপ্রতিরোধ্য জনমত সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারী ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমান ১৯৯৫ সালে ৩৯.৫ শতাংশ ছিল। ১৯৯৯ সালে এ হার ২৬.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহের দায় গ্রহণ করলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও এ হার কমে আসবে। খেলাপি ঋণ হ্রাসের জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেখানে সংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি সেখানে সমস্যা জটিলতর হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান এ বছরে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা হবে বলে সাময়িকভাবে হিসাব করা হয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধি না করার ফলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রায় ১,৬৩৩ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লোকসানের কারন অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, বিগত সরকারের আমলে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচী ছিল ত্রুটিপূর্ণ। বস্তুতঃ দেশের বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিমূর্ত ধারনার উপর এসব সংস্কার কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল। আমাদের গত চার বছরের অভিজ্ঞতায় একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের অর্থনীতিতে বিশ্বায়ন সফল করতে হলে, আমাদের সংস্কার প্রক্রিয়াকে ‘‘স্বদেশায়ন’’ করতে হবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচীকে ‘‘স্বদেশায়ন’’ করে উল্লেখযোগ্য কৌশলগত পরিবর্তন করেছে। আগে চালু কল কারখানা বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা হতো। এতে একদিকে শ্রমিকদের স্বার্থহানি হতো এবং শ্রমিক অসন্তোষের ফলে বিরাষ্ট্রীয়করণ বিলম্বিত হতো। বর্তমানে বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রে তিনটি নতুন নীতি অনুসরন করা হচ্ছে। প্রথমত, যে সব প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত করা হয় সে সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পাওনা আগে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যেখানে সম্ভব সেখানে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা শ্রমিকদের

কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, যে সব প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত জমির পরিমান বেশি সে সব প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত জমি আলাদা করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সংশোধিত নীতিমালা গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্কার দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং লোকসানের পরিমান ক্রমশ হ্রাস পাবে।

মাননীয় স্পীকার,

২০। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়ে বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সাহসী নেতৃত্বে ত্রাণ ও পুণর্বাসনের চ্যালেঞ্জ যেভাবে মোকাবেলা করেছে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। আমি এই মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশে সম্পদ ক্ষতির পরিমান মোট জাতীয় উৎপাদের প্রায় ছয় শতাংশ হলেও আমরা কৃষি খাতে এর ঋণাত্মক প্রভাব ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরেই অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কিন্তু বন্যার ফলে রপ্তানী বানিজ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ায় এবং অবকাঠামো মেরামত সময় সাপেক্ষ হওয়ায় অকৃষি খাতসমূহে বন্যার প্রভাব প্রলম্বিত হয়। বিশেষ করে শিল্প খাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের সমান প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে শিল্প উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫৪ শতাংশ। বন্যার ফলে এ প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩.১৯ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অবশ্য অনুরূপ সময়ে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল

২.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড বিশ্লেষণের জন্য আমি এখন এই অর্থ বছরের মুদ্রা সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনার প্রবণতাসমূহ তুলে ধরব।

২১। বন্যার ফলে অর্থনীতির কোন কোন খাতে সৃষ্ট মন্দা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে গত দু'বছর ধরে দেশের মুদ্রা সরবরাহে পরিমিত সম্প্রসারনমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ১৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর ১৯৯৯ থেকে দেশের সকল তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণের হার (CRR) তাদের মোট মেয়াদী ও তলবী দায়ের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারন করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে সুদের হার কমানো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক রেট কমিয়ে শতকরা ৮ ভাগ থেকে শতকরা ৭ ভাগে নির্ধারন করা হয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রদত্ত সুবিধার ফলে অভ্যন্তরীন ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের তুলনায় ২০০০ সালের মার্চ মাসে অভ্যন্তরীন ঋণ বৃদ্ধি পায় ১৩.৮ শতাংশ ও বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ১১.৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে অভ্যন্তরীন ঋণ ১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে সম্প্রসারণশীল মুদ্রা নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতির উপর এর কোন বিরূপ প্রভাব দেখা দেয়নি। গত দশ মাস ধরে প্রতি মাসেই মূল্যস্ফীতি কমেছে। বর্তমানে এই হার খুবই সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২২। ১৯৯৮ সালে বন্যার ফলে রপ্তানী খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে এই হার ছিল ১৬.৮৩ শতাংশ। কিন্তু বন্যার ফলে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে এই প্রবৃদ্ধির হার ৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বছরের শেষ তিন মাসে এই হার আরো বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পোষাক শিল্প, চামড়া ও রাসায়নিক দ্রব্যের রপ্তানী বেড়েছে। তবে চা ও পাটজাত দ্রব্যাদি - এ দু'টি খাতে রপ্তানী বর্তমান অর্থ বছরে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে বৈদেশিক সাহায্য বাবদ পাওয়া গেছে ৮৩০ মিলিয়ন ডলার; গত অর্থ বছরে অনুরূপ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে জুলাই-জানুয়ারী সময়কালে বর্তমান অর্থ বছরে গত অর্থ বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় আমদানী ২.৫ শতাংশ বেড়েছে।

২৩। রপ্তানী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করছে। প্রথমতঃ রপ্তানী বানিজ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘ দিন ধরে দৈনিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate) অনুসরন করে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করছে। বর্তমান অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত মার্কিন ডলারের সাথে টাকার মূল্যমান দুই বার পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ৪.৯০ শতাংশ ও পাউন্ডের বিপরীতে ৩.২২

শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে। এর ফলে একদিকে রপ্তানী উৎসাহিত হয়েছে অন্যদিকে প্রবাসী নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমান বেড়েছে। জুলাই হতে এপ্রিল সময়কালে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৮০ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান অর্থ বছরে অনুরূপ সময়ে এই অংক ১৫৫৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবৃদ্ধির হার হলো প্রায় ১২.৮ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত রপ্তানী খাতে ভর্তুকি ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে তৈরী পোষাক, তৈরি চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত দ্রব্যাদি, ফুল, কাঁথা ইত্যাদি রপ্তানী খাতে বিভিন্ন সহায়তা ও ভর্তুকি বাবদ ৬৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরেও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে অনুরূপ সুবিধার জন্য ৬৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

২৪। গত চার বছরের অভিজ্ঞতা পর্য্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে যে, স্থিতিশীল সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাতে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের শুধু অতীত নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেই চলবে না, ভবিষ্যতের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড যথার্থই

বলতেন, "Anyone keeps learning stays young, the greatest thing in life is to keep your mind young" (যারা শিখে তারাই নবীন থাকে। জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হলো নিজের মনকে নবীন রাখা)। যে সব ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি সে সব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান অবশ্যই সুসংহত করতে হবে। সাথে সাথে যে সব ক্ষেত্রে এখনও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি সে সব ক্ষেত্রেও আমাদের নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাজেট সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমি সরকারের কয়েকটি নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

২৫। মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌত পুঁজি ছিল উন্নয়নের চালিকা শক্তি। একবিংশ শতাব্দিতে উন্নয়নের পরিনিয়ন্তা হলো জ্ঞান। যে সব উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌত পুঁজি অপ্রতুল একবিংশ শতাব্দিতে তাদের জন্য উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সুফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌছাবে না। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে কম্পিউটার ও শুধুমাত্র কম্পিউটার যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সহ সকল কর প্রত্যাহার করা হয়। সফটওয়্যার শিল্পের সম্প্রসারনের জন্য টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। প্রদত্ত সুবিধাদির সুফল আমরা এখনও পুরোপুরি পাইনি। কেননা তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের পথে একটি বড় অন্তরায় হলো এই যে, দেশে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ-মান সম্পন্ন প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যে কোন সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত প্রোগ্রামার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে। একটি বিশেষ কমিটি এসব আবেদন বাছাই করে বরাদ্দ সম্পর্কে সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে এ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হবে।

মাননীয় স্পীকার,

২৬। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশে শিল্পখাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত সন্তোষজনক। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্প খাতে মোট প্রায় ৫,৮৫৬ কোটি টাকা বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩৮.৮ ভাগ বেশী। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৫১৫৮.৭ কোটি টাকা ও ৬৯৭.৪ কোটি টাকা যথাক্রমে চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪২.৭ ভাগ এবং শতকরা ১৫.৪ ভাগ বেশী। সর্বশেষ হিসাব হতে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ সময়কালে) ৮,৫০৮ কোটি টাকার শিল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ১,১৫৮ কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ। তবে বাংলাদেশে শিল্প খাতের মূল সমস্যা বিনিয়োগের পরিমান নয়। শিল্প খাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগ

মুষ্টিমেয় সংখ্যক খাতে সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল দুটো খাতে বিনিয়োগ মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই দু'টি খাত হলো সফটওয়্যার শিল্প এবং কৃষিপণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। এর একটি কারন হলো, এ দুটো খাত এখনও ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই দু'টি খাতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল (Equity Development Fund) প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের নেতৃত্বে ব্যাংকের বোর্ড এ তহবিলের ব্যবস্থাপনা করবেন। অর্থনৈতিক দিক হতে গ্রহণযোগ্য সফটওয়্যার শিল্পে ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে এ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্য্যন্ত সমমূলধন (equity) বিনিয়োগ করা হবে। আমি আশা করছি যে, এ ব্যবস্থার ফলে এ দু'টি খাতে নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।

২৭। অতীতের অব্যবস্থাপনার ফলে সৃষ্ট মন্দ ও কুঋণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের কার্যকারিতা সীমিত করে রেখেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের লোকসানের বোঝা একদিকে দেশের করদাতারা বহন করছে অন্যদিকে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের স্বাভাবিক সুদের উচ্চতর হারে সুদ দিতে হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের এ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে সে সব সংস্থার ব্যাংকের কাছে দেনা শোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে আমি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহকে ১৮০০ কোটি টাকার সুদযুক্ত বন্ড প্রদানের প্রস্তাব করছি। এই সুবিধা বিবেচনা করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ যে সব অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ সে সব খাতে সুদের হার হ্রাস করার এবং সময়মত ঋণ পরিশোধকারী উদ্যোক্তাদের

শ্রেণীভেদে ৫ হতে ১০ শতাংশ রিবেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অবিলম্বে স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা করবে।

মাননীয় স্পীকার,

২৮। কবি জীবনানন্দ দাস এক সময়ে গর্ব ভরে লিখেছিলেন, "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর"। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা আজ তার হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া নিয়ে হারিয়ে গেছে, অবলুপ্ত হয়ে গেছে অজস্র প্রজাতির পাখি, প্রাণী, উদ্ভিদ ও পুষ্প। পরিবেশ অবক্ষয় শুধু এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই ম্লান করেনি, দেশের নাগরিকদের জীবনের প্রতিও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নগরাঞ্চলে পরিবেশ দূষণ প্রকট রূপ ধারন করেছে। ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণের রূঢ় বাস্তবতা একজন বিখ্যাত পরিবেশবাদীর উক্তি মনে করিয়ে দেয়ঃ "Should we allow environmental deterioration to continue, man's fate may be worse than extinction (আমরা যদি পরিবেশ দূষণ চলতে দেই, তবে মানুষের ভাগ্য অবলুপ্তির চেয়েও ভয়াবহ হবে)। এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে দারিদ্র। যান্ত্রিক দূষণের সাথে সংযুক্ত হয়েছে মানবেতর বস্তির ক্ষতিকর আবর্জনা। সরকার জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে এ জটিল সমস্যার সমাধান শুধু একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; এ সমস্যার সমাধানে সুশীল সমাজ ও আপামর জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সমস্যা শুধু অর্থ বা কারিগরী সাহায্যের নয়। এখানে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানেরও অভাব রয়েছে। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ সমাধান চিহ্নিত করার জন্য

পরীক্ষামূলক ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পৌর এলাকার অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের পুনর্বাসন ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে আমি তাই ১৫ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ থেকে বস্তি পুনর্বাসন ও নগরাঞ্চলে পরিবেশ প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচীর জন্য উপযুক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অনুদান দেওয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার,

২৯। আমি এখন ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রধান বিশেষত্বসমূহ পেশ করছি। এই অর্থ বছরে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৪,১৫১ কোটি টাকা, এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭,৫০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও কর ব্যতীত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬,৬৫১ কোটি টাকা। বাধ্যতামূলক প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শণ ব্যবস্থা প্রচলনে বিলম্ব, আমদানী ও শিল্প খাতে নিম্ন হারে প্রবৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বিবেচনা করে সংশোধিত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করের লক্ষ্যমাত্রা ১৬,০০০ কোটি টাকায় নির্ধারন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও অভ্যন্তরীন বাজারে মূল্য অপরিবর্তিত রাখার ফলে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়াতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে না। তাই অন্যান্য কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৩৪৫ কোটি টাকাতে পুনঃ নির্ধারন করা হয়েছে। এর ফলে প্রাক্কলিত রাজস্বের তুলনায় প্রায় ২,৮০৬ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে। এখানে

উল্লেখ্য যে, বর্তমান অর্থ বছরে এ ধরনের রাজস্ব ঘাটতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ভারতে প্রাককলিত রাজস্ব প্রাপ্তিতে প্রায় ৪ শতাংশ ঘাটতি দেখা গেছে।

৩০. রাজস্ব প্রাপ্তির ঘাটতির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ বৃদ্ধি ও টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় প্রায় ২,৮০৫ কোটি টাকা হতে সংশোধিত বাজেটে ৩,৫৫৪ কোটি টাকাতে উন্নীত হয়েছে। অন্যান্য খাতে কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও সুদ বাবদ দেনা শোধ করার লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ ১৮,৪৪৪ কোটি টাকাতে নির্ধারন করার প্রস্তাব করছি। পক্ষান্তরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর পুনর্বাসন সম্পূর্ণ করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ১৫,৫০০ কোটি টাকা হতে ১৬,৫০০ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ৩,৯৩৪ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেবে যা ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ সংগ্রহ করে অর্থায়ন করতে হবে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের মূল বাজেটে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি (fiscal deficit) জাতীয় আয়ের নতুন হিসাবের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদের ৫.৩ শতাংশ ছিল; সংশোধিত বাজেটে সার্বিক ঘাটতি জাতীয় উৎপাদের প্রায় ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে। উল্লেখ্য যে ভারতে ১৯৯৪-৯৫ হতে ১৯৯৯-২০০০ সময়কালে সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে একত্র করে) জাতীয় উৎপাদের সর্বনিম্ন ৬.২ শতাংশ হতে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের মধ্যে ছিল। কিন্তু এ ধরনের ঘাটতি সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে স্থিতিশীল আর্থিক পরিবেশে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। ইটালিতে ১৯৯০ এর দশকে বাজেট ঘাটতি ছিল জাতীয় উৎপাদের প্রায় ১০ শতাংশ; জাপানে এই হার এখনও প্রায় ৮ শতাংশ।

৩১। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋন গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশ সরকারের ঋণের পরিমান ও মূল্যস্ফীতির মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (correlation) পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে সরকারের ঋণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত জুলাই থেকে প্রতি মাসেই মূল্যস্ফীতির হার কমেছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের ফলে এখন পর্যন্ত বেসরকারী খাতের জন্য আদৌ কোন তারল্য সংকট দেখা যায়নি। সরকারের ঋণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাংকসমূহের কাছে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমান ছিল তাদের মোট আমানতের ৬.৩ শতাংশ। উপরন্তু বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে বেসরকারী ঋণ ১১.৫ শতাংশ বেড়েছে। তৃতীয়ত, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রবার্ট আইজনার (Robert Eisner) যথার্থই বলেছেন যে, সরকারের ঋণ ক্ষতিকারক না কল্যাণকর তা নির্ভর করে সরকার ঋণ নিয়ে কি করে তার উপর। যদি ঋণ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক বিনিয়োগে ব্যয়িত হয় তবে ঋণের কুফলের চেয়ে সুফলই হবে বেশী। যেহেতু ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচী অর্থায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে সেহেতু এ ধরনের ঋণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করছি। বাজেট ঘাটতি প্রসঙ্গে Economist (মে ২০-২৬, ২০০০) পত্রিকা সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে যথার্থই মন্তব্য করেছে, "Sometimes it should be boosting public investment instead. If a budget surplus is achieved by starving, say, education or public infrastructure of funds, this would actually reduce future growth" (পক্ষান্তরে কখনও কখনও সরকারী ব্যয় বাড়াতে হবে। যদি শিক্ষা অথবা সরকারী খাতে অবকাঠামোকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত বাজেট করা হয় তবে তা ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস করবে)।

মাননীয় স্পীকার,

৩২। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৪,১৯৮ কোটি টাকা। এই লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩.৩ শতাংশ বেশি। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে মোট ব্যয় ১৯,৬৩৩ কোটি টাকাতে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রাক্কলন বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৬.৪ শতাংশ বেশি। এই ব্যয় বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারন হলো সরকারের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের পরিমান বৃদ্ধি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে সুদ বাবদ বরাদ্দ হলো ৩,৫৫৪ কোটি টাকা এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বাবদ ৩,৭৪৮ কোটি টাকা লাগবে। সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি বাদ দিলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে মূল বাজেটের তুলনায় ব্যয় ১০৫ কোটি টাকা হ্রাস পেত এবং ২০০০-২০০১ সালের রাজস্ব বাজেটে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেত মাত্র ৫ শতাংশ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে তফাৎ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। প্রথমত প্রতি বছর উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সরকারকে ঋণ নিতে হচ্ছে। অথচ এর সুদ, যা বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের ১৯ শতাংশ, দিতে হয় রাজস্ব বাজেট থেকে। এর ফলে রাজস্ব বাজেটের আকার ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি ক্রমেই বাড়ছে। সামাজিক খাতে রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের মধ্যে গুনগত বিশেষ তারতম্য নেই। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে সামাজিক খাতের অংশ ছিল ১৩ শতাংশ। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে

রাজস্ব বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত সামাজিক খাতের হিস্যা ২৪ শতাংশে দাঁড়াবে। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর ঐ সব প্রকল্পে কর্মরতদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে সমাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর মেরামত বাবদ ব্যয়ও রাজস্ব বাজেটে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কাজেই রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ব্যয় উন্নয়ন ব্যয় হতে সরাসরি উদ্ভূত হচ্ছে। কাজেই রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের কৃত্রিম ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অদূর ভবিষ্যতে দুই ধরনের বাজেট একীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগীরাও সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে বাজেটকে কৃত্রিমভাবে বিভাজনের এ ব্যবস্থা অবসানের জন্য সুপারিশ করেছে।

৩৩। উন্নয়নের চাহিদা বিবেচনা করে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ১৭,৫০০ কোটি টাকাতে নির্ধারন করা হয়েছে। এই আকার ১৯৯৯-২০০০ সালের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তুলনায় ১৩% বেশি। প্রস্তাবিত বরাদ্দের ৫০.২ শতাংশ আসবে অভ্যন্তরীন সূত্র হতে এবং ৪৯.৮ শতাংশ আসবে বৈদেশিক সূত্র থেকে। তবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য অভ্যন্তরীন সূত্রের সম্পূর্ণ অর্থায়ন রাজস্ব উদ্বৃত্ত হতে করা সম্ভব হবে না। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরেও প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থায়নের জন্য ৩,৫১৪ কোটি টাকা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হবে। তবে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি (fiscal deficit) জাতীয় আয়ের হিস্যা হিসাবে প্রায় ৫.৯ শতাংশে দাঁড়াবে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৪। বর্তমান সরকারের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রে রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের সচেতন প্রয়াস। তাই সম্পদ বন্টনে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে দারিদ্র বিমোচনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে ৫,৩১৩.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ৬,০০৬.১০ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে দারিদ্র নিরসনের জন্য (যথা খয়রাতি সাহায্য, কাজের বিনিময়ে সাহায্য, দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও উন্নয়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, দরিদ্রদের গৃহায়ণ, বয়স্কদের জন্য ভাতা, পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে) ব্যয় ৩,৪৩৯.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে এ বরাদ্দ ৩,৮৯২ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে দারিদ্র নিরসনের জন্য বরাদ্দ হয় ৮,৭৫২.৫৯ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই অঙ্ক ৯,৮৯৮.১ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচন খাতে ব্যয় ১৩ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের ২৬.২৮ শতাংশ দারিদ্র নিরসনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই হিস্যা ২৬.৬০ শতাংশে দাঁড়াবে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৫। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট মিলে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে। এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ

হলো প্রায় ৫,৫৯৬ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৫২২ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ২,০৭৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষা খাতে এ অভূতপূর্ব বৃদ্ধির একটি বড় কারন হলো বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের জন্য বেতন বাবদ অনুদান ছিল ১২০ কোটি টাকা, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ ২৩৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাবদ অনুদান ছিল ৩৯৫ কোটি টাকা, বর্তমান অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ৬৫৪ কোটি টাকাতে উন্নীত করা হয়েছে, অর্থাৎ গত তিন বছরে এ বরাদ্দ প্রায় ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়কালে বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বাবদ অনুদান ২২৭ কোটি হতে বাড়িয়ে ৩৪৪ কোটি টাকাতে নির্ধারন করা হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য সর্বমোট অতিরিক্ত বাৎসরিক খরচ প্রায় ৪৯১ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ অনুযায়ী সরকারী অনুদানের অংশ দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক স্কুলে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হতে সরকারী বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। নিবন্ধনকৃত বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের জন্য ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৪ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ ১১০ কোটি টাকাতে উন্নীত করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে এই খাতে ব্যয় গত তিন বছরে প্রায় দ্বিগুন করা হয়েছে।

৩৬। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৯ সালের জুন পর্য্যন্ত ৭,২১৪টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১,৭৯২টি বেসরকারী মাদ্রাসা এবং ৫৭৪টি বেসরকারী কলেজের ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। তিনটি নতুন প্রকল্পের আওতায় ৫,১২৪টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩১৭টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১,৭৪১টি বেসরকারী মাদ্রাসা ও ৩টি সরকারী মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০ শিক্ষা বর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি থানায় নির্বাচিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এস,এস,সি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১১৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের জন্য ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে বইপত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা জোরদার করা হয়েছে। উপরন্তু ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি ও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ওয়াদা অনুসারে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী কর্মসূচীর বাস্তবায়ন চলছে।

মাননীয় স্পীকার,

৩৭। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদা করেছিল, "সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে"। এই প্রতিশ্রুতির আলোকে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি অনুসারে, স্বাস্থ্য শুধু অসুস্থতা বা জরা হতে মুক্তি নয় - স্বাস্থ্য হচ্ছে মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যাধি হতে সম্পূর্ণ মুক্তি। ব্যাপক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে মোট বরাদ্দ ছিল ১,৬১১ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ২,৬৮৯ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল রাজস্ব বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯৯০.২০ কোটি টাকা; ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ১,১১২ কোটি টাকায় নির্ধারনের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল মেয়াদ কালে ৯,৯৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১,৫৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রতি ৬০০০ নাগরিকের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৮০০০ ক্লিনিক নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মধ্যে ৬০০০ ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া, ১৮০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১১টি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নির্মাণ

কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার চার হাজার নার্সকে নতুন নিয়োগ দিয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে কর্মরত ৪১৯৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এক হাজার নতুন ডাক্তার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপরন্তু বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের জন্য ৩৫.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩৮। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালে তদানীন্তন সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো চাহিদার অনুপাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অপারগতা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে দেশে বিদ্যুতের কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২১০৫ মেগাওয়াট। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে গত চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৯২ কিলোওয়াট ঘন্টা, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে তা ১১০ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। গত চার বছরে মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯.৫ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ১২৫৬ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা হয়েছে - এর মধ্যে রয়েছে সরকারী খাতে ৪৫০ মেগাওয়াট, বেসরকারী খাতে ৩০২ মেগাওয়াট, মিশ্র খাতে ৭০ মেগাওয়াট ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসনের মাধ্যমে ৪৩৪ মেগাওয়াট। উপরন্তু শুল্ক ও কর মওকুফের সুযোগ দিয়ে পাওয়ার জেনারেটর ব্যবহার উৎসাহিত করে প্রায় ৪৭৬ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে

বেসরকারী খাতে ১১৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে ৩০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেও বিদ্যুতের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৭৭০ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে এ বরাদ্দ ২,২০২ কোটিতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ প্রায় ২৪.৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সব দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়বহুল সে সব অঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তির সম্প্রসারনের জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ খাতে প্রশাসনিক সংস্কার জোরদার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩৯। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ৮টি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ৪টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীর সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি করা হয়েছে। এই ৮টি ব্লকে এখন পর্যন্ত ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। এ ছাড়া আরো ৯টি ব্লক বৃহৎ তেল কোম্পানীকে বরাদ্দ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, বিদেশী বিনিয়োগের ফলে দেশে গ্যাস উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ১৯৯৯-২০০০ সালের উন্নয়ন বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৬০৯ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ৬৫৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

৪০। পরিবহন খাতের উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই অপরিহার্য নয়, দারিদ্র নিরসনের জন্যও অত্যন্ত কার্যকর। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সর্ব্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পরিবহন খাতে। এই খাতে প্রায় ২,৫৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বরাদ্দের প্রায় ৬৭.৩ শতাংশ ব্যয়িত হবে সড়ক খাতে, ৪.২ শতাংশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর বকেয়া বিল পরিশোধিত হবে, রেলওয়ে খাতে ব্যয়িত হবে ২২.৪ শতাংশ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ খাতে ৪.৭ শতাংশ আর নৌ পরিবহণ খাতে ১.৪ শতাংশ। বর্তমান সরকারের শাসনামলে প্রথম তিন বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১৮১৭ কিলোমিটার সড়ক সম্পূর্ণরূপে পাকা করার ও ১৩৬৯ কিলোমিটার সড়কে ইট বিছানোর কাজ সম্পন্ন করেছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৭১৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ৫০ কিলোমিটার ইট বিছানোর কাজ সম্পন্ন হবে। প্রমত্ত যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু চালু করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ সূচিত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রায় ২০,৯৪৬ মিটার স্থায়ী সেতু গত চার বছরে নির্মাণ করেছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে পদ্মা নদীর উপর পাকশী সেতু নির্মানের জন্য ১২০ কোটি টাকা, যমুনা সংযোগ সড়কের জন্য ২টি প্রকল্পে ২১০ কোটি টাকা, ধরলা সেতু নির্মানের জন্য ৩০ কোটি টাকা, দোয়ারিকা সেতু নির্মানের জন্য ৩০ কোটি টাকা, গাবখান সেতু নির্মানের জন্য ৪০ কোটি টাকা, রূপসা সেতুর জন্য ৪৫ কোটি টাকা, পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য ৩ কোটি টাকা ও ভৈরব বাজারে মেঘনা সেতুর জন্য ৭৫ কোটি টাকা। উপরন্তু সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের

নিয়ন্ত্রণাধীন সড়কসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১। বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সরকারী ও বেসরকারী খাতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের ৪.৯ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের শেষে এ সংখ্যা প্রায় ৬ লাখে দাঁড়াবে এবং ২০০০-২০০১ সালে এ সংখ্যা ৮ লাখে উন্নীত হবে। ইতোমধ্যে পাঁচটি বেসরকারী সংস্থা দেড় লাখ টেলিফোনের সংযোগ প্রদান করেছে। সম্প্রতি একটি বেসরকারী কোম্পানীকে ২ লক্ষ সংযোগ দেওয়ার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটি বেসরকারী কোম্পানীকে ৩ লাখ টেলিফোন সংযোগের লাইসেন্স দেওয়ার প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০০১ সাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী খাতে দেশে মোট টেলিফোন সংখ্যা হবে প্রায় ১২ লাখ। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটে ডাক ও টেলিফোন উপখাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৫২ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ৪৮৩ কোটিতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

৪২। কৃষি খাতে সরকারের অনুসৃত নীতিমালা ও তার সুফল আমি ইতোমধ্যে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। কৃষি খাতে সুষ্ঠু উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি গৃহীত হয়েছে। শুধু ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিই কৃষি নীতির লক্ষ্য নয়। কৃষি নীতির লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক দিক হতে

লাভজনক ও পরিবেশসম্মত টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে ভূমির উৎপাদনশীলতা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। এই প্রেক্ষিতে কৃষি ক্ষেত্রে একটি সুচিন্তিত, সমন্বিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে; জীব-প্রযুক্তি (Biotechnology) প্রবর্তণের ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরই সারের জন্য ভর্তুকি চালু করা হয়। আমি ২০০০-২০০১ অর্থ বছরেও সারের ভর্তুকির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এ ভর্তুকির পরিমান আরো বাড়ানো হবে। কৃষিখাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ছিল ৮০৪.৯২ কোটি টাকা, এ বরাদ্দ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ৮৭৭ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

৪৩। আমি এখন খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। কৃষি খাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করে তোলা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন দেশে খাদ্যশস্যের সরকারী মজুতের পরিমান ছিল ১১.৯৯ লক্ষ টন, ২০০০ সালের ৩০শে জুন মজুতের পরিমান ১০.৭৫ লক্ষ টনে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমান কর্মসূচী অনুসারে ২০০১ সালের ৩০শে জুন মোট খাদ্যের মজুত দাঁড়াবে ১১.৪৮ লক্ষ টনে। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে নিজস্ব সম্পদে বিদেশ হতে কোন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়নি এবং অভ্যন্তরীন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টনে বাড়ানো হয়। বর্ধিত খাদ্যশস্য সংগ্রহের সাথে খাদ্য গুদামসমূহ মেরামত ও পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে খাদ্য উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৪৪। নদী-মাতৃক বাংলাদেশে পানি একই সাথে আশীর্বাদ ও অভিশাপ। মানবদেহের শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য নদ-নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে আমাদের এই বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ জুড়ে। এরা যেন বাংলাদেশের জীবনরেখা। আবার এরাই কখনো কখনো ধারন করে ভয়াল রূপ, হয়ে উঠে কীর্তিনাশা। বিপন্ন কৃষক বিধ্বস্ত জনপদের বাসিন্দারা তখন পানিকে দেখে অভিশাপরূপে। প্রকৃতির খেয়ালিপনায় কখনো বা পানি-প্রাচুর্যের এই জনপদ মুখোমুখি হয় পানি সংকটের। দেখা দেয় খরা। প্রকৃতির এই বিচিত্র খেলার হাত থেকে মুক্তির জন্য পানি সম্পদের সুষ্ঠু, সুসমন্বিত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতি প্রণীত হয়েছে। পানি নীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। একই সাথে সমগ্র দেশব্যাপী নদী/খাল খনন/পুনঃখনন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাংগন থেকে জনপদ রক্ষা, নৌচলাচল বৃদ্ধির জন্য ৮২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ ১,২২১ কোটি টাকায় নির্ধারনের প্রস্তাব করছি।

৪৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই লিখেছেন, "যে পল্লী বাংলাদেশের প্রাণনিকেতন, সেইখানেই রয়েছে কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, সেইখানেই কর্মের সার্থকতা লাভ হয়"। বর্তমান সরকারের সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্রও হলো পল্লী অঞ্চল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও ভৌত অবকাঠামো সকল খাতেই পল্লী অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। উপরন্তু পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক

উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭২৭.১৫ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ বরাদ্দ ১,৬০৩.২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ১,৮২৩.৭৬ কোটি টাকাতে নির্ধারনের প্রস্তাব করছি। পাঁচ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে বরাদ্দ ২৫০ শতাংশ বেড়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বরাদ্দের প্রায় ৭২ শতাংশ অর্থাৎ ১,৩১৭ কোটি টাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৪৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে। উপরন্তু রাজস্ব বাজেটে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। গত তিন বছরে এ অধিদপ্তর ৬,৫২৬ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ১০,৮৬৪ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক নির্মাণ করেছে। বর্তমান অর্থ বছরে এই অধিদপ্তর অতিরিক্ত ১,৯২৪ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ৫,৬৫৫ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক উন্নয়ন ও ৩০৯৪টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ সম্পূর্ণ করবে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নয়টি প্রকল্পের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১৪৩.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নির্দেশিত "একটি বাড়ী একটি খামার" প্রকল্পের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ২২৫ কোটি টাকা, পৌরসভা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ১৩০ কোটি টাকা, জেলা পরিষদ বাবদ ৬৫ কোটি টাকা এবং চারটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য ১১৫ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য ১২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ রয়েছে ৫০ কোটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৮.১৩

কোটি টাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ২০ কোটি টাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭.৮৮ কোটি টাকা।

৪৬। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে পরিবেশ আদালত আইন প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ১১৭৬টি তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে এবং ২৩টি দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রায় ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের জন্য ১১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশব্যাপী বনায়ন, বন্য প্রাণী ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বন খাতে ১৪৪.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পানিতে আর্সেনিক দূষণ উপশমের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে ১৭৮.৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের জন্য ৪৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বায়ু দূষণ রোধে ১৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরীক্ষামূলকভাবে জ্বালানি খাতে একটি সি-এন-জি (CNG) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪৭। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মৎস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে মোট জাতীয় উৎপাদে মৎস্য

উপখাতের হিস্যা ছিল ৫.৩৬ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই হিস্যা ৬.১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯৬ শতাংশ, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই প্রবৃদ্ধি ৯.৫০ শতাংশে দাঁড়াবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মৎস্য উপখাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭০.৯৫ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এই উপখাতে ১০৭.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। পশু পালন খাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ হলো ৯৮.৫৭ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ১০২.১৮ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

৪৮। বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই খাতে ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভৌত পরিকল্পনা ও পানি সরবরাহ খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১,১১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৪৩.৭৪ কোটি টাকা, বিশেষ এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা ওয়াসার জন্য ১৭৫.৮৬ কোটি, চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য ১৬ কোটি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১১৬.৫৫ কোটি এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য ২৭৭.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪৯। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুব ও ক্রীড়া জগতে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী ক্রীড়া কর্মকান্ডে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক সাফল্যসমূহ অত্যন্ত গৌরবোজ্জল। জুন-জুলাই, ১৯৯৯ এ নর্থ ক্যারোলিনায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশ ২১টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। জুলাই, ৯৯ এ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপে আমাদের সোনার ছেলেরা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৯ এ কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ৮ম সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়। গত এপ্রিলে ঢাকায় সাফল্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এশিয়া একাদশ বনাম বিশ্ব একাদশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। অতি সম্প্রতি সাফল্যের সাথে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সপ্তম এশিয়া কাপ ক্রিকেট সমাপ্ত হয়েছে। অত্যন্ত আশার কথা, বাংলাদেশ এখন ক্রিকেটে টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্তির দ্বার প্রান্তে। তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া খাতে উল্লেখিত ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমি আগামী অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ২৮.৭২ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ১৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৩ কোটি এবং ২৪টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্ম কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫০। বাংলাদেশের সংস্কৃতি একই সাথে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের চেতনার উৎস; তার ধারক ও বাহক। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে আমরা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি। একই বছরে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় চিত্রশালা ও নাট্যশালার নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জন্য ১৯.৯৯ কোটি টাকা, বাংলা একাডেমীর জন্য ৫.৭৬ কোটি টাকা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের জন্য ১৩.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংস্কৃতি খাতে মোট প্রস্তাবিত উন্নয়ন বরাদ্দ হলো ৪৬ কোটি টাকা। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে টুংগী পাড়ায় ১৬.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণ এগিয়ে চলছে এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের জন্য ৫.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫১। জন্মলগ্ন হতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুর্বল ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। উপরন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে নারী নির্যাতন রোধ ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচী জোরদার করা হয়েছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ ছিল ৭৬ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ১০৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব ও

উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১০৬.৭২ কোটি টাকা, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ২২৪ কোটি টাকাতে নির্ধারনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে বয়স্ক ভাতার জন্য ৫০ কোটি টাকা; দুস্থ, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা মহিলাদের ভাতার জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং গৃহায়ণ তহবিলের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫২। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষনার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের আধুনিকায়ন ও দক্ষতার মান-উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার জন্য সামরিক ইনস্টিটিউট (Military Institute of Science & Technology) এবং সেনাবাহিনীর মেডিকেল কলেজ (Armed Forces Medical College) স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিরক্ষার ন্যায্য চাহিদা বিবেচনা করে আমি প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মোট ৩,২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১৯৯৯-২০০০ বছরের মূল বরাদ্দের চেয়ে ৬.৯ শতাংশ বেশি।

৫৩। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকার করেছিল যে, পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়ে দেশে আইন-শৃঙ্খলা প্রশাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান

সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশের বাজেট ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে পুলিশ খাতে বরাদ্দ ছিল (রেশন ছাড়া) ৫১৮.৬৭ কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে (রেশন ছাড়া) এ বরাদ্দ ৮০০.৭৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। পুলিশ ষ্টাফ কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। পুলিশকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতকরণ, পুলিশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানবাহন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ''ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানী'' চালু করা হয়েছে এবং এই খাতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ''পুলিশ কল্যাণ ট্রাষ্ট'' গঠনের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আনসারদের ভাতা ২০% হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত অঙ্গীভূত আনসারদের স্থায়ী করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৫৪। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালী জাতির অবিনশ্বর কীর্ত্তি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লাখ শহীদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত ও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের চরম আত্মত্যাগে মহিমান্বিত। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়, ''আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে, চৈতণ্যের প্রতিটি মোর্চায়'' বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি ''গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্য্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের মতো'' উড়ছে অবিরাম। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণ পোষণ ও পুণর্বাসন আমাদের একটি পবিত্র জাতীয় দায়িত্ব। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা

করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন একুশ বছর ধরে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টকে পুণর্গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ভাতার পরিমান ও ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬.৬০ কোটি টাকা, ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ ১৬.২৫ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের সম্প্রসারিত কর্মসূচী সত্ত্বেও অনেক দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা এখনও কোন সরকারী সহায়তা পায়নি। তাই ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি নতুন কর্মসূচী চালু করা হবে। এই নতুন কর্মসূচীর জন্য ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৫। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাদের পক্ষে মুক্তির সংগ্রাম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের এ সংগ্রাম সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিতে হবে। গত চার বছরে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। তবু আমাদের আরো অনেক দূরে এগিয়ে যেতে হবে। এ সংগ্রামের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একদিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিবেশে নানা প্রতিকূলতা ও জটিলতা; অন্যদিকে অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কালো হাত এখনও জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। অনেকে তাই আশংকা প্রকাশ করে থাকেন যে অদূর

ভবিষ্যতে আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করতে পারব কি না। শত অন্তরায় সত্বেও আমি আশাবাদী। জর্জ বার্নার্ড শ এর ভাষায় আমিও বলতে চাই "You see things and you say, "Why"? But I dream things that never were; and say, "Why not" (আপনারা বাস্তবে দেখছেন এবং ভাবছেন "কেন তা ঘটছে"। আমি যা কোনদিন ছিলনা তার স্বপ্ন দেখি এবং বলি "কেন তা হবে না"?)। নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন সার্থক করে তুলবো।